বিবর্তন বাদ ঃ বিজ্ঞান বনাম বৈদিক ব্যাখ্যা

বিবর্তন কথাটি বিস্তৃত অর্থে বিবেচনা করলে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি, বিকাশ ও লয় এবং পুনঃসৃষ্টি... এই প্রক্রিয়া বুঝায়। এরূপ বিস্তৃত অর্থে এবং ব্যাপক পরিধিতে বিবর্তনের বিষয়টি এই নিবন্ধে ব্যাখ্যা করে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি কোন থেকে এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে তার সাথে বৈদিক ব্যাখ্যার তুলনা করা হবে।

– শ্রী মনোরঞ্জন দে

আধুনিক বিজ্ঞানীরা বিবর্তন বাদের আলোচনাকে সূর্যসহ বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রাণীর (মনুষ্য পর্যন্ত) সৃষ্টি পর্যন্ত মূলতঃ সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

ক. বিবর্তন বাদ ঃ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা

বিজ্ঞানের মহাবিস্ফোরন তত্ত্বের (Big Bang Theory) আলোকে বলা যায় আমরা প্রতিদিন যে সূর্যকে নিরীক্ষণ করি তাতে কার্বন (carbon) অথবা অক্সিজেন (Oxygen) এর চেয়ে শতকরা ২ অংশ বেশী ভারী বিভিন্ন পদার্থ নিহিত আছে। তাদের মতে সূর্য হল মহাবিস্ফোরন পরবর্তী দুই বা তৃতীয় স্তরের নক্ষত্র। এটি কম বেশী ৫ হাজার মিলিয়ন বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়। আর পদার্থবিজ্ঞানীদের মতে এই জড় পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে আরোও পরে। পৃথিবীর বয়স ৪ হাজার মিলিয়নের মতো।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম ২ হাজার মিলিয়ন বছরে এর তাপমাত্রা এত বেশী ছিল যে সেটি কোন ধরনের জীবনের জন্য অনুপোযুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে এটি ক্রমশঃ ঠান্ডা হতে আরম্ভ করে। একসময় ধীরে ধীরে সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সময় থেকে অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর উদ্ভব হয় যা এক সময় চূড়ান্ত পর্যায়ে মানব দেহের রূপ নেয়।

বিজ্ঞানের স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কিত পর্যালোচনার আলোকে কিছু আধুনিক বিজ্ঞানী দাবী করেন যে পৃথিবী এবং সূর্যের উৎপত্তি প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে হয়েছিল (১ বিলিয়ন = ১ হাজার মিলিয়ন)। প্রাথমিক স্তরে এই জড় পৃথিবী অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। যে কোন জীবের উৎপত্তির জন্য তাতে কোন অনুকূল পরিবেশ ছিল না। সময় ব্যবধানে এটি ক্রমশঃ শীতল হতে আরম্ভ করে। একসময় বিভিন্ন পাথর রাজি (rockx) থেকে নির্গত গ্যাস দ্বারা এর মধ্যে সামান্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঐ প্রাথমিক পরিবেশও মনুষ্য জীবনের জন্য অনুকূল ছিলনা। কারণ তখনও পর্যন্ত মনুষ্য জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সৃষ্টি হয়নি। পরিবর্তে ছিল হাইড্রোজেন সালফাইড সহ- নানা ধরনের বিষাক্ত গ্যাস। তবে এরূপ পরিবেশেও কিছু অতি প্রাথমিক পর্যায়ে জীবনের উদ্ভব হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই পরিস্থিতি মূলতঃ সমুদ্রে বিভিন্ন অনুর সমন্বয়ে যে সামষ্টিক-মলিকুলার কাঠামো সৃষ্টি হয় তার থেকেই উদ্ভব হয়। এসব মলিকুলার নিজেরাই নিজেদের পুনঃ প্রজনন আরম্ভ করে এবং এভাবে একসময় প্রাণী জগতের বিবর্তন শুরু হয়। প্রথমে যে প্রাণের সৃষ্টি হয় তা জড় জগতে প্রথম দিকে সৃষ্ট হাইড্রোজেন সালফাইড সহ অপরাপর বিষাক্ত উপাদান বহন করে অক্সিজেন নিঃসরন করা আরম্ভ করে। এই অবস্থা ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর পরিবেশ পরিবর্তন করতে শুরু করে। একসময় এমন অনুকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যাতে মাছ, সরীসৃপ, স্তন্য পায়ী জীব এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মনুষ্য জীবনের উৎপত্তি ঘটে।

চার্লস ডারউইন (Charlex Darwain) তার The Origin of Species by Means of Natural Selection (London, Peguin Boors, 1968) বইতে কিভাবে এই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণের সৃষ্টি হয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মতে প্রকৃতিগত কারণে অথবা প্রকৃতির নির্বাচনের ফলেই সময় ব্যবধানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর সৃষ্টি/উদ্ভব হয়েছে। তার মতে যেসব প্রাণী বৈশিষ্ট গত এবং গুনগত ভাবে খুবই কাছাকাছি/অনুরূপ ধরনের সেগুলো বিলীন হয়ে সময় ব্যবধানে উন্নত প্রজাতির প্রাণীর সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে যে কেউ সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন তোলতে পারেন যে ডারউহন এর বিবর্তন বাদ যদি সত্য হয় তবে মানব ইতিহাসে সময় ব্যবধানে এতদিনে আমাদের জড়জগতে নুতন নুতন প্রাণীর উদ্ভব এবং বিকাশ লাভ করার কথা। কিন্তু বাস্তবে এরূপ কোন অবস্থাতো দেখতে পাওয়া যায় না! বিবর্তন বাদীরা প্রাণী জগতের বিবর্তনের প্রমাণ হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ার এক ধরনের ক্ষুদ্র জীবের কথা উল্লেখ করেন যেটি নিজের বাচ্চাদের স্তনের দুধ পান করায় অথচ ডিম্ব প্রসব করে। তারা এরূপ অবস্থাকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী স্তরের প্রাণ হিসাবে বিবেচনা করেন। কিন্তু এরূপ অনুমান অথবা ধারনার কোন ভিত্তি নেই। কারন বর্তমানকালের প্রাণীবিদরা মনে করেন উপরোক্ত duck-billed platypus নিজেই একটি সম্পূর্ন প্রজাতির প্রাণী।

উপরোক্ত উদাহরনের প্রেক্ষিতে ডারউইন তার কথিত বইতে বানর প্রজাতির প্রাণী থেকে মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরেন। তার মতে সময় ব্যবধানে দুই প্রজাতির বানর ও মানুষের মধ্যেকার সংযোগ বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু অনেক জীব বিজ্ঞানী মানুষের বিবর্তনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুইটি মতবাদের মধ্যে সুস্পষ্ঠ বিরোধীতা লক্ষ্য করেন।

১। একদিকে বলা হয়েছে যে duck-billed platypus হল বিবর্তনের মধ্যবর্তী স্তর যা এখনও বিরাজমান; আবার বলা হল বানর প্রজাতির প্রাণী ও মানুষের মধ্যবর্তী

প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই দুই অবস্থা ডারউইন-এর বিবর্তন তত্ত্বের বিরোধী হয়ে দাড়াঁয় না কি?

২। ১৯৮২ সালে ইংল্যান্ডের লেইসেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ Shackley তার এক নিবন্ধে প্রাণী জগতের বিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে বর্তমানকালেও পৃথিবীর কিছু জায়গায় Neamderthal মানুষের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। অথচ ডারউইন এর বিবর্তন বাদ অনুযায়ী এই ধরনের মানুষ টিকে থাকার কথা নয়।

অনুজীব বিজ্ঞানী Dr. Senapathy সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত তার Independence Birth Organism নামক পুস্তকে ডারউহন এর বিবর্তন তত্ত্ব নাকচ কর দেন। ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী জড়জগতের বিভিন্ন প্রজাতি মূলত আদিম জলাশয়ে সৃষ্ট একক বা কিছুসংখ্যক এককোষী জীব থেকে উদ্ভব হয়। আর জড়জগতে যে উন্নত ধরনের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় তা আসলে উপরোক্ত সৃষ্টি থেকে প্রকৃতির নির্বাচন মাত্র। কিন্তু Dr. Senapathy যুক্তিদেন যে সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় যে সব জীন (genes) এর উদ্ভব হয় সেগুলো আসলে বহুকোষী জীবের জটিল জীনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল, অনুজীব নয় যা বিবর্তনবাদীরা প্রাথমিক ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে জীবন কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যা একবার মাত্র পৃথিবীতে উদ্ভব হয়। এর অর্থ হল বিশ্বব্রহ্মান্ডে অনেক গ্রহ থাকতে পারে যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। Dr. Senapathy- এর এই শেষোক্ত বক্তব্যের খুবই কাছাকাছি বর্তমানের বিজ্ঞানীরা পৌছেঁছেন বলা যায়। এই বক্তব্য বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত বিবর্তন বাদের অনেকটা অনুরূপ বলা যায়, যেখানে দাবী করা হয় জড় বিবর্তন মূলতঃ উপর থেকে নীচে হয়েছে।

বিবর্তন সম্পর্কে উপরোক্ত ধারনা/মতবাদ মূলতঃ দুটি অর্জিত নুতন ধারনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যা পুরানো বিবর্তন তত্ত্ব নাকচ করে দেয়ঃ-

(১) প্রথমত ঃ এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি পৃথক জীবের বংশ বিস্তার বিবর্তনের একটি স্তরে এসে পৌছে প্রকৃতির নিয়মেই স্থায়ী ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

(২) দ্বিতীয়ত ঃ কিভাবে জীন সমূহে (genes) প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান একত্রিত হয় তা বিবেচনা করে এই তত্ত্বে তার বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তদুপরি জীবনের সম্পূর্ন ধারা প্রকৃত প্রস্তাবে পরিসংখ্যাগত ভাবে একটি অপরিহার্য্য বিষয় ছিল; এটি কোন অসম্ভব বিষয় যা অনেক পূর্বে ধারনা করা হতো।

উল্লেখ্য যে ডারউইন নিজেও স্বীকার করেন যে তার তত্ত্বে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে যার সমাধান আজ পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন প্রজাতির উৎস সম্পর্কিত আলোচনার সময় তিনি বিভিন্ন প্রাণীর জটিল ধরন ও গঠনের বর্ননা এবং ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা স্বীকার করেন। তিনি নিজেই তার The Origin of Species mAPf KuPUj : "To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aborration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, in the highest degree."

(চলবে)

বিবর্তন বাদ ঃ বিজ্ঞান বনাম বৈদিক ব্যাখ্যা

বিবর্তন কথাটি বিস্তৃত অর্থে বিবেচনা করলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, বিকাশ ও লয় এবং পুনঃসৃষ্টি... এই প্রক্রিয়া বুঝায়। এরূপ বিস্তৃত অর্থে এবং ব্যাপক পরিধিতে বিবর্তনের বিষয়টি এই নিবন্ধে ব্যাখ্যা করে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি কোন থেকে এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে তার সাথে বৈদিক ব্যাখ্যার তুলনা করা হবে।

– শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এরপর আলোর বিভিন্ন বর্নের স্থানচ্যুতি হলে অক্ষিগোলকের সমন্বয় সাধন করি যাতে তা সুক্ষ্ম ভাবে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই ধরনের কার্যক্রম প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিষয় কোন ক্রমেই হতে পারে না। এসব হল ইন্দ্রিয়ের কার্যক্রম এবং তার ফলশ্রুতি যা বৈদিক শাস্ত্রেও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

ডারউইন তার উক্ত বইতে আরোও স্বীকার করেন পৃথিবীতে পূর্বে যে সব মধ্যবর্তী প্রজাতি ছিল নিশ্চয়ই সে গুলোর সংখ্যা অসংখ্য ছিল। তা হলে কেন সব ধরনের ভূ-তাত্বিক গঠন এবং কাঠামোতে এরূপ মধ্যবর্তী সংযোগ পুরাপুরি পরিলক্ষিত হয় না? ভূতত্ব বিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে এরূপ কোন সুন্দরভাবে বিকশিত সংযোগের বিষয় তুলে ধরতে পারে নি। এরূপ অভিজ্ঞতাকে তিনি তার তত্ত্বের বিরুদ্ধে অন্যতম উৎকৃষ্ট যুক্তি হিসাবে মেনে নেন। তার কথায় : "The number of intermediate varieties, which formerly existed on the earth, must be truely enormous. Why then is not every geological formel ation and every stratum full of such intermediate links? Geology asseredly does not reveal any such finely graduated organic chain; and this, perhaps, is the most obvious and gravest objection which can be urged against my theory."

ডারউইন এর বিবর্তন তত্ত্ব কি মাত্রায় কতটুকু সঠিক সে ব্যাপারে পরবর্তীকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্থান খনন করে বিভিন্ন প্রানীর ফসিল এবং পাথর ও মাটির গঠন সম্পর্কে অনেক গবেষনা করা হয়। কিন্তু এসব থেকে ভুতত্ত্ব এবং প্রাণী বিজ্ঞানীরা জীবনের উৎস এবং বিবর্তন সম্পর্কে কোন ঐক্যমতে এখনও পৌছঁতে পারেন-নি। এই প্রসঙ্গে সুইডেন-এর লান্ড (Lund) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক N. Heribert-Nilson : "It is not even to make a caricature of evolution out of paleo biological facts. The fosil material is now so complete that the lack of transitional series cannot be explained by the scarcity of material. The deficiencies are real. They will never be filled. অর্থাৎ নিঃষ্প্রান ঘটনার সম্ভার থেকেও বিবর্তন বিষয়ক কোন হাস্যকর বা অতি রঞ্জিত তত্ত্ব তৈরী করা সম্ভব নয়। বর্তমানকালে বিভিন্ন প্রাণীর যথেষ্ট ফসিল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাই যথপোযুক্ত ফসিলের অভাবে প্রাণী জগতের বিবর্তনের মধ্যবর্তী স্তরের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না–এই যুক্তি এখন আর ধোপে টিকে না। আসলে মধ্যবর্তী স্তরের ফসিল প্রকৃত অর্থেই কম পাওয়া যায়/গিয়েছে। এই ঘাঠতি কখনো পূরণ হওয়ার নয়।

প্রাণরসায়নবিদরা (Bio-chemists) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের শিলা/পাথরের মধ্যে জীবনের প্রকৃতি পর্যবেক্ষন করে প্রানের বিবর্তন সম্পর্কে প্রচুর গবেষনা করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারাও পাথর/শিলার মধ্যে যে ধরনের ফসিলের সন্ধান পান তা সবক্ষেত্রে ক্রম-বিবর্তনের বিষয়টি প্রতি ফলিত করে না। বিখ্যাত প্রাণ-রসায়নবিদ D.B. Gower এর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ঃ "In the oldest rocks, we did not find a series of fossils covering the gradual changes from the most primitive creatures to developed forms, but rather in the oldest rocks, developed species suddenly appeared. Between every species there was a complete absence of intermediate fossils."

সবশেষে বলা যায়, ক্রমবিবর্তনকে যদি সাধারন থেকে জটীল স্তরের একটি বিষয় বলে মেনে নেয়া হয় তবে বর্তমানকালে পূর্ণ বিকশিত যে সব জীবিত প্রাণী রয়েছে সে গুলোর আদিপুরুষদের অস্তিত্ব থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে এসব দেখা যায় নাই এবং বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন যে এ ব্যাপারে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীন।

গ. বিবর্তনবাদ ঃ বৈদিক ব্যাখ্যা ঃ জড় জগতের বিবর্তন

বিজ্ঞানের কথিত বিবর্তনবাদ বিরাজমান থাকার সাধারণ কারণ হল এই যে কোন উন্নততর ব্যাখ্যা একে চ্যালেঞ্জ করে উদ্ভব হয়নি। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে বিশেযতঃ শ্রীমদ্ ভগবতমে আমরা বিভিন্ন প্রজাতির বিবর্তনের একটি প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ চিত্র খুজে পাই।

বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী জড় জগতে ৮৪ লক্ষ যোনির বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে ৪ লক্ষ হল মনুষ্য প্রজাতির এবং বাকী ৮০ লক্ষ হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-পালা,

পোকামাকড়, পক্ষী, জলজ প্রাণী এবং স্তন্যপায়ী জীব। বৈদিক শাস্ত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তিন ধরনের গ্রহ-লোকে (planetary systems) বিভক্ত করা হয়েছেঃ উচ্চলোক, মধ্যলোক এবং নিম্নলোক। আমাদের এই জড়-পৃথিবী মধ্য গ্রহ-লোকে অবস্থান করছে বলা যায়। শাস্ত্র অনুযায়ী ব্রহ্মার ১ দিন হল এক সহস্র চর্তুযুগ। এক চর্তুযুগের সময় সীমা হল ৪৩,২০০০০ বছর (কলিযুগ=৪,৩২০০০ বছর, দ্বাপর যুগ = ৮,৬৪,০০০ বছর, ত্রেতাযুগ=১২,৯৬,০০০ বছর এবং সত্যযুগ =১৭,২৮,০০০ বছর)। সুতরাং ব্রহ্মার একদিন হল **৪৩,২০০০×১০০০=৪৩২,০০,০০০,০০ সৌর বছর**। আবার তার এক রাত্রিও ৪৩২,০০,০০০,০০ সৌর বছর। ব্রহ্মার আয়ু সত্যলোকের (ব্রহ্মলোকের) ১০০ বছর। সুতরাং সৌর জগতের সময় অনুযায়ী তার আয়ুস্কাল হল ৮৬৪,০০,০০,০০০×৩৬৫×১০০ = ৩১৫৩৬০০০০০০০০ বছর। ব্রহ্মার আয়ুস্কালের অর্ধেক সময় অর্থাৎ ১৫৭৬৮০০০০০০০০ সৌর বছর ইতিমধ্যে পার হয়ে গিয়েছে। এখন ব্রহ্মার দিবা ভাগকে ব্রহ্মলোকের দিন এবং রাত্রি ভাগকে ব্রহ্মলোকের রাত্রি বলা হয়। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী প্রতি ব্রহ্মদিনের শেষে মধ্য গ্রহলোক ধ্বংস হয়ে যায় এবং পরবর্তী দিন আরম্ভ হওয়ার সময় পুনঃরায় এর উদ্ভব ঘটে। সুতরাং বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী আমাদের এই জড়জগতের পুনরাবির্ভব ২১৬, ০০, ০০, ০০০ বছর তথা ২.১৬ বিলিয়ন বছর পূর্বে হয়েছে। শ্রীমদ ভাগবতে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে এই হল আমাদের বর্তমান জড়া পৃথিবীর সৃষ্টির বয়স। পরমানু-পদার্থ বিজ্ঞান অনুযায়ী পৃথিবীর বয়স কমবেশী ৪ বিলিয়ন বছর। এর মধ্যে ১ থেকে ২ বিলিয়ন বছর এর তাপমাত্রা এত বেশী ছিল যে ঐ অবস্থায় কোন প্রাণের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনাই ছিল না। পরবতী ৩ থেকে ২ বিলিয়ন বছরে জীবন সৃষ্টির পরিবেশ খুব ধীরে ধীরে গঠিত হয়। এ থেকে বুঝা যায় জড় পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কিত ভাগবতীয় হিসাব আধুনিক বিজ্ঞানের অনেকটা কাছাকাছি।

শ্রীমদ্ ভাগবত অনুযায়ী আংশিক প্রলয়কালীন সময়ে (ব্রহ্মার রাত্রি ভাগ নির্দেশ করে) এই ব্রহ্মাণ্ডের সব ধরনের জীব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই সাথে জড়া পৃথিবীও বিলীন হয়ে যায়। আবার নুতন ব্রহ্মলোক আরম্ভ হলে জড়া পৃথিবীতে সৃষ্টি শুরু হয় এবং তা ব্রহ্মার দিবাভাগ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। তবে শ্রীমদ্ ভাগবত অনুযায়ী মনুষ্য সহ বিভিন্ন প্রজাতির জীব উচ্চ লোক থেকে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীতে আসা হয়েছে। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান থেকেই সমস্ত জীবের সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীমদ্ ভাগবত অনুযায়ী ত্রিভুবন একসময় জলমগ্ন ছিল। তখন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু একাকী মহানাগ অনন্তের শয্যায় শায়িত ছিলেন। স্বগ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবন যখন প্রলয়ের জলে লীন হয়ে যায় তখন কাল নামক শক্তির সাহায্যে ত্রিলোকের সমস্ত জীব তাদের সুক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে। এই প্রলায়ে স্থুল শরীর অপ্রকট হয়, কিন্তু সুক্ষ্ম শরীর থাকে, ঠিক জড় সৃষ্টির জলের মতো। এরপর কাল শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবসমূহ তাদের স্বকাম কর্মের বিকাশ করার জন্য

বেরিয়ে আসতে শুরু করে। জীবের সকামকর্মের এই সমগ্র স্বরূপ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাভি ভেদ করে একটি পদ্মের কালর মতো আকার ধারণ করে এবং তা ভগবানের ইচ্ছায় একটি পদ্মফুলের মতো সবকিছুকে উদ্ভাসিত করে বিশাল প্রলয়বারি শুকিয়ে দেয়। (৩/৮/১৪)। এই সর্বলোকময় পদ্মফুলে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং পরমাত্মারূপে প্রবেশ করেন এবং এইভাবে যখন তা প্রকৃতির সমস্ত গুনের দ্বারা পরিপূর্ন হয় তখন বৈদিক জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, যাঁকে স্বয়ম্ভু বলা যায়, তিনি উৎপন্ন হয়েছিলেন।(৩/৮/১৫)। শ্রীমদ্ ভগবতের এই শ্রোকটির বিশদ ব্যাখ্যা করলে বলা যায় ঃ পদ্ম ফুলটি হল জড় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট-রূপ। প্রলয়ের সময় এটি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর নাভিতে লীন হয়ে যায়। আবার সৃষ্টি রচনার সময় তার প্রকাশ ঘটে। এটি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রভাবে হয় যিনি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ সমস্ত জীবের সকাম কর্মের সমষ্টি হল এই রূপ। তাদের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রনকারী প্রথম জীব ব্রহ্মা এই পদ্ম ফুল থেকেই আবির্ভূত হন। সৃষ্টির এই প্রথম জীব ব্রহ্মা অন্যকোন জীবদের মত নন। তাঁর কোন জড় পিতা নেই; তাই তাকে স্বয়ম্ভু বলা হয়- অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় ভাবেই তার জন্ম হয়। প্রলয়ের সময় তিনি বিষ্ণুর সঙ্গে নিদ্রা যান এবং পুনরায় যখন সৃষ্টি পরমেশ্বর ভগবান আরম্ভ করেন তখন এই ভাবেই তাঁর আবার জন্ম হয়। ভগবানের এই বর্ননায় তিনটি ধারনা নিহিত রয়েছে ঃ স্থুল-বিরাট রূপ, সুক্ষ্ম হিরন্যগর্ভ এবং জড় সৃজনাত্মক শক্তি ব্রহ্মা। আর পদ্ম ফুলকেই সমস্ত ধরনের প্রানের উৎস বলা যায়। এখন ব্রহ্মার সমগ্র আয়ুস্কাল হল ৩১৫৩৬০০০০০০০০০০ সৌর বছর। তার জীবনের প্রথম অর্ধেক সময় হল ১৫৭৬৮০০০০০০০০০০ বছর। তাই বলা যায় ব্রহ্মালোক তথা সত্যলোকে প্রথমে সৃষ্ঠ জীবিত প্রানী ব্রহ্মা ১৫৭৬৮০০০০০০০০০০ সৌর বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা ছিলেন সর্বোচ্চ জ্ঞান এবং অতিমানবীয় গুনের অধিকারী। পরবর্তী সময়ে তিনি রজোঃগুনের দ্বারা প্রনোদিত হয়ে সৃষ্টি করতে অনুপ্রানিত হন। এভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত অনুযায়ী জড় জগতের আদি স্রষ্টা হলেন স্বয়ং ভগবান। তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, যিনি আবার ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে পরবর্তী স্রষ্টা হন। (৩/৯/২২)। এভাবে বৈদিক শক্তি অনুযায়ী সৃষ্টির প্রক্রিয়া উপর থেকে নীচে আরম্ভ হয়। (৩/৯/৪৩)।

আসলে জড় জগৎ এবং সমস্ত জীব বীজরূপে পরমেশ্বর ভগবান পূর্বেই উৎপন্ন করে রেখেছিলেন। ব্রহ্মার কাজ ছিল সেই সমস্ত বীজগুলোকে সারা ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দেয়া। তাই বাস্তবিক সৃষ্টিকে বলা হয় সর্গ এবং ব্রহ্মা কর্তৃক তার পরবর্তী অভিব্যক্তিকে বলা হয় বিসর্গ।

পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় এক সময় ব্রহ্মা পূর্বে উল্লেখিত পদ্মটির কর্নিকাতে প্রবেশ করেন। তারপর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সেই পদ্মটিকে তিনি প্রথমে তিনটি ভাগে এবং পরে চৌদ্দটি বিভাগে ভাগ করেন। (৩/১০/৮)। নিম্নে পাতাললোক, মধ্যে ভূর্লোক (আমাদের জড় পৃথিবী) এবং উর্ধ্বে ভূর্লোক (স্বর্গ)। এই ত্রিভুবনের স্রষ্টা হলেন ব্রহ্মা। তিনি বিভিন্ন প্রকার জীবের বসবাসের জন্য চতুর্দশ ভুবনও সৃষ্টি করেন।

শ্রীমদ্ ভাগবত অনুযায়ী সৃষ্টির প্রকারভেদ হল নয় ধরনের। এগুলো নিম্নরূপ ঃ-

১। নয় প্রকার সৃষ্টির প্রথমটি হল মহত্তত্ত্ব বা সমগ্র জড় উপাদান বর্নিত সৃষ্টি, যাতে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতির ফলে প্রকৃতির গুনগুলি ক্রিয়া করে। অন্যকথায় বলা যায় জড় সৃষ্টির জন্য পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রথমে যার উদ্ভব হয় তাকে বলা হয় মহত্তত্ত্ব।

২। দ্বিতীয় সৃষ্টিতে অহংকারের উদ্ভব হয় যাতে জড় উপাদান সমূহ, ভৌতিক জ্ঞান এবং প্রাকৃত বা জড়জাগতিক কর্মের উদয় হয়। কাল বলতে এক্ষেত্রে জ্ঞানের উৎস হিসাবে ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তাদের নিয়ন্ত্রনকারী দেবতা বুঝায়। ক্রিয়া বলতে কর্মেন্দ্রিয় এবং সেগুলোর নিয়ন্ত্রনকারী দেবতাদের বুঝায়। এসবেরই উদ্ভব হয় সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে।

৩। তৃতীয় সৃষ্টিতে তন্মাত্র বা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির উদয় হয়।

৪। চতুর্থ সৃষ্টিতে জ্ঞান এবং কর্মক্ষমতার উদ্ভব হয়।

৫। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে জাত দেবতাগন এবং মন হল পঞ্চম সৃষ্টি।

৬। ষষ্ঠ সৃষ্টি হল অজ্ঞান-অন্ধকার যার ফলে জীব বুদ্ধিহীনের মতো আচরন করে।

উপারাক্ত সৃষ্টি সমূহ পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রাকৃত সৃষ্টি। অপরাপর সৃষ্টি সমূহ হল রজোগুনের অবতার ব্রহ্মার সৃষ্টি। অর্থাৎ সপ্তম থেকেই ব্রহ্মার সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

৭। সপ্তম সৃষ্টি হল স্থাবর সমূহের সৃষ্টি। এই সৃষ্টি ছয় প্রকার ঃ বনস্পতি (ফুলবিহীন ফলবানবৃক্ষ), ঔষধি (যে গাছ ফল পাকলে মরে যায় – যেমন কলাগাছ), লতা, ত্বকসার (বেনুবৃক্ষ), বীরুধ (যে সব লতা আরোহনে সক্ষম) এবং দ্রুম (ফুল দ্বারা ফলবান)।

৮। অষ্টম স্তরে হয় নিম্নস্তরের প্রাণীর সৃষ্টি। এরা বিভিন্ন ধরনের এবং তাদের সংখ্যা আটাশ। তারা অত্যন্ত মুর্খ এবং অজ্ঞ। এরা ঘ্রানের দ্বারা নিজের অভীষ্ট বস্তুকে জানতে পারে। কিন্তু নিজেদের হৃদয়ে কোন বস্তুর স্মরণ করতে অক্ষম। নিম্ন স্তরের প্রানীদের মধ্যে গরু, ছাগল, মহিষ, কৃষ্ণসার, শুকর, হরিন, ভেড়া, উট ইত্যাদি খুর বিশিষ্ট। আবার অশ্ব, খচ্চর, গর্দভ, শরভ এবং চমরী হল এক খুর বিশিষ্ট পক্ষান্তরে কুকুর, শিয়াল, বাঘ, বৃক, বিড়াল, শক, শজারু, সিংহ, বানর, হাতী, কূর্ম, কুমীর, গোসাপ ইত্যাদি হল পঞ্চনখ বিশিষ্ট প্রাণী। ক্রৌঞ্চ, শকুন, বক, বাজ, ভাস, ভল্লুক, ময়ুর, হংস, কাক, পেঁচক ইত্যাদি হল পক্ষীশ্রেনীর।

৯। নিম্নগামী খাদ্যনালী বিশিষ্ট যে মনুষ্য শ্রেণী তা শুধু এক প্রকার। তারা হল নবম সৃষ্টি। মানুষের মধ্যে রজোগুনের প্রাধান্য বেশী। তাই মানুষ নানা রকম দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও সর্বদা কর্মতৎপর থাকে।

(চলবে)

বিবর্তন বাদ ঃ বিজ্ঞান বনাম বৈদিক ব্যাখ্যা

বিবর্তন কথাটি বিস্তৃত অর্থে বিবেচনা করলে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি, বিকাশ ও লয় এবং পুনঃসৃষ্টি... এই প্রক্রিয়া বুঝায়। এরূপ বিস্তৃত অর্থে এবং ব্যাপক পরিধিতে বিবর্তনের বিষয়টি এই নিবন্ধে ব্যাখ্যা করে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি কোন থেকে এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে তার সাথে বৈদিক ব্যাখ্যার তুলনা করা হবে।

– শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবশ্য ভাগবতে দশম সৃষ্টি হিসাবে দেবতাদের সৃষ্টির কথাও বলা হয়েছে। সপ্তম থেকে দশম সৃষ্টি হল বৈকৃত সৃষ্টি যা পূর্বে বর্ণিত প্রাকৃত সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। বৈকারিক দেব সৃষ্টি আটরকমের (১) দেব, (২) পিতৃ, (৩) অসুর, (৪) গন্ধর্ব ও অপ্সরা, (৫)যক্ষ ও রাক্ষস, (৬) সিদ্ধ, চারন ও বিদ্যাধর (৭) ভুত, প্রেত ও পিশাচ এবং (৮) কিন্নর ইত্যাদি। ব্রহ্মা এদের সৃষ্টি করেন।

এখন দেখা যাক ব্রহ্মা কিভাবে তার সৃষ্টিকার্য পরিচালনা করেন। পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহে ব্রহ্মা এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে জড়জাগতিক মৈথুন ছাড়াই তিনি তার নিজের শরীর থেকে অপরাপর জীব সৃষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ করতে সক্ষম হন। অর্থাৎ ব্রহ্মার শরীরের মধ্যেই ৮৪ লক্ষ শ্রেণীর প্রজাতির বীজ নিহিত ছিল যার ফলে তার পক্ষে প্রথম দিকে তিনি নিজের দেহ থেকেই জীব উৎপন্ন করেন। প্রথমে ব্রহ্মা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামের চারজন মহর্ষিকে সৃষ্টি করেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন উর্ধ্বরেতা। তাই তাঁরা জড়জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে অনিচ্ছুক হন (৩/১২/৫)। পরবর্তীতে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে সন্তান-সন্ততি বিস্তার করার জন্য দশজন পুত্র উৎপাদন করেন যাদেরকে প্রজাপতি বলা হয় (৩/১২/২১)। এরা হলেন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরো, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ট, দক্ষ এবং নারদ। এদের মধ্যে অনেককে তিনি তাঁর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে উৎপন্ন করেছিলেন। যেমন বশিষ্টের জন্ম হয়েছিল তাঁর নিঃশ্বাস থেকে, দক্ষ তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি থেকে, ভৃগু তাঁর ত্বক থেকে এবং ক্রতু তাঁর হাত থেকে। পুলস্ত কান থেকে, অঙ্গিরো মুখ থেকে, অত্রি নেত্র থেকে, মরীচি মন থেকে এবং পুলহ ব্রহ্মার নাভি থেকে উৎপন্ন হয়েছিল।(৩/১২/২৩-২৪)। এসব ঋষিরা মহাবীর্যবান হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমান বৃদ্ধি পায় নাই। কারন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অধিক প্রজননের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন নাই। অধিক প্রজননের চিন্তায় তখন ব্রহ্মা মগ্ন হন এবং ঐ অবস্থায় তার দেহ থেকে একজন পুরুষ এবং রমনীর সৃষ্টি হয়। এই পুরুষ স্বায়ম্ভুর মনু এবং রমনী তাঁর মহিষী শতরূপা নামে পরিচিত হন। (৩/১২/৫২-৫৪)। যথাসমায়ে মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ভে পাচঁটি সন্তান উৎপন্ন হয়– দুই পুত্র প্রিয়ব্রত, এবং উত্তানপাদ, তিন কন্যা- আকূতি, দেহুতি এবং প্রসূতি (৩/১২/৫৬)। পিতা মনু তাঁর প্রথমা কন্যা আকূতিকে রুচিনামক ঋষিকে দান করেন। মধ্যমা কন্যা দেহাহুতিকে কর্দম নামের এক ঋষিকে দান করেন এবং কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে দক্ষের নিকট দান করেন। তাঁদের থেকে ক্রমাগত সমগ্র জগৎ জনসংখ্যায় পরিপূর্ণ হয়। (৩/১২/৫৬-৫৭)।

উপরোক্ত উপায়ে মনুষ্যকুলের বিবর্তনের বিষয়টি বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখিত রয়েছে। অপরাপর প্রাণীর উৎপত্তির বিষয়টির দিকে এখন দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। ব্রহ্মার পুত্র মরীচির ঔরসে তাঁর স্ত্রী কলার গর্ভে কশ্যপ মুনি জন্ম গ্রহন করেন। ইনি দক্ষ প্রজাপতির তের জন কন্যাকে বিবাহ করেন। এই এয়োদশ কন্যার নাম হল ঃ অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্ঠা, সুরসা, মুনি, ইলা, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভী, সরমা, এবং তিমি। এই তেরজন রমনী থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির তেরটি প্রজাতির সৃষ্টি হয়। যেমন অদিতি হতে দেবগন, দিতি থেকে দৈত্যগন, দনু হতে দানবগন, কাষ্ঠা হতে অশ্বাদি পশুগন, অরিষ্ঠা থেকে গন্ধর্বগন, সুরসা থেকে রাক্ষসকুল, ইলা হতে বৃক্ষ-উদ্ভিদ সমূহ, মুনি হতে অপ্সরাগণ, ক্রোধবশা থেকে পিশাচকুল, তাম্রা থেকে পক্ষী সমূহ, সুরভি থেকে গো-মহিষাদি চতুষ্পদ জন্তু, সরমা হতে শ্বাপদসমূহ এবং তিমি থেকে জলজন্তু উৎপন্ন হয়।

বৈদিক শাস্ত্রের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় ব্রহ্মার যে সব পুত্র প্রজাপতি নামে খ্যাত ছিলেন তারা মনুষ্য হলেও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী সৃষ্টিতে সক্ষম ছিলেন। কারন তারা ব্রহ্মার দেহ থেকে উৎপন্ন বলে তাঁর দেহাভ্যন্তরে নিহিত ৮৪ লক্ষ শ্রেণীর বীজ এসব প্রজাপতি প্রাপ্ত হন। এজন্যই অনেকে উচ্চতর থেকে নিম্নতর প্রাণী সৃষ্টিতেও সক্ষম হন। এসব প্রজাপতির স্ত্রীরাও শুধুমাত্র মানুষ নয়, অধিকন্তু পাখী, সরীসৃপ, জলজন্তু, বৃক্ষ ইত্যাদি জন্ম দান/সৃষ্টিতেও সক্ষম ছিলেন। একথা সত্য যে আধুনিক যুগে অনেকেরই কাছে এই ধরনের তথ্য অস্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রথমে মনে হবে না। অর্থাৎ সৃষ্টির সমস্ত উপাদান একজনের (পরমেশ্বর ভগবানের)

কাছ থেকে অন্য জনের (ব্রহ্মা) কাছে এবং এভাবে পরম্পরায় নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের (প্রজাপতিগন) নিকট কিভাবে উত্তরন হতে পারে। যারা এসবে বিশ্বাস করতে চান না তাদের কাছেই প্রশ্ন কিভাবে তাহলে আধুনিক বিজ্ঞানীরা তথাকথিত মহাবিস্ফোরন তত্ত্ব ব্যাখ্যার সময় যে কালো গহ্বরের (Black Hole) কথা বলেন সেখানে তো তাদের কথিত সমস্ত শক্তি এবং জড় উপাদানসমূহ একত্রিত হয়েছিল। একসময় এ থেকেই মহাবিস্ফোরন ঘটে এবং তার ফলশ্রুতিতে গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে এই জড়জগৎ এবং প্রাণী কুলের উদ্ভব ঘটে। তাহলে কি বলা যায় না সৃষ্টির উৎপত্তি এবং বিবর্তনের সব কিছুর বীজ এককেন্দ্রিক ছিল। এই জড় জগতেও আমরা কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ পাই যেখানে পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে অস্বাভাবিক আকার-আকৃতি বিশিষ্ট শিশু জন্ম নেয়। পত্রপত্রিকা ঘাটলে দেখতে পাওয়া যায় একাধিক মাথাবিশিষ্ট শিশু, ত্রিনেত্র বিশিষ্ট শিশু, একচোখ ওয়ালা শিশু, জোড়ালাগা দুই শিশু ইত্যাদির মত ঘটনা। তাই বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখিত সৃষ্টি এবং তার বিবর্তনের বিষয়টি উড়িয়ে দেয়ার মত কোন বিষয় হতে পারে না।

বৈদিক শাস্ত্রের বর্নিত বিবর্তন প্রক্রিয়া ডারউইনের কথিত বিবর্তন প্রক্রিয়া থেকে নিম্নোক্ত দিক থেকে ভিন্ন বলা যায় ঃ

(১) ডারউইন বলেছেন এককোষী ব্যাকটেরিয়া বা অনুজীব থেকে বিভিন্ন প্রজাতির বিকাশ লাভ হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী এই বিবর্তন হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্টি এবং অনুগৃহীত একজন অতি বুদ্ধিমান জীব থেকে (ব্রহ্মা)।

(২) ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী অতি প্রাথমিক/সাধারন কাঠামো থেকে ক্রমশ জটীল কাঠামোর মধ্য দিয়ে মনুষ্য কুলের জন্ম হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্র অনুয়ায়ী অতি সুক্ষ অথচ সর্বব্যাপী একটি জটীল কাঠামো থেকে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। এর যুক্তি সংগত একটি কারন রয়েছে। কেননা জটীল প্রজাতির পক্ষেই সৃষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সংরক্ষন করে রাখা সম্ভব যার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে সরল প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে। এর বিপরীতে কোন যুক্তি থাকতে পারে কি? পাঠকবর্গ কি বলেন? এই কারনেই বৈদিক শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির বিবর্তনের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ স্তর থেকে মধ্যবর্তী এবং মধ্যবর্তী থেকে নিম্ন স্তরে ক্রমে ক্রমে দেখানো বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিবর্তনের এই আরোহ পদ্ধতি (inductive system) বিজ্ঞানের কথিত অবরোহ (deductive system) পদ্ধতি থেকে নিঃসন্দেহে উন্নত বলা যায় বৈকি।

ঘ. বিবর্তন বাদ ঃ বৈদিক ব্যাখা-চেতনার বিবর্তন

ভৌতিক/জড়-বিবর্তন ছাড়াও বৈদিক শাস্ত্রে আর এক ধরনের বিবর্তনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তা হল চেতনার/আত্মার (conciousness) বিবর্তন। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী প্রতিটি প্রজাতির দেহে চেতনা রয়েছে যাকে আত্মা বলা হয়। জড় দেহের আকৃতির পরিবর্তন হলেও এই চেতনার (আত্মা) ধ্বংস নেই।

এই জড় জগত ৮৪ লক্ষ যোনি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রজাতির জীবে পরিপূর্ণ। প্রতিটি জীবের চেতনা/আত্মা গুনগতভাবে অভিন্ন। তবে যে সব জড় দেহে এসব চেতনা রয়েছে সে গুলোর গঠন-প্রকৃতি এবং আকৃতির তারতম্য হেতু চেতনার স্তর বিভিন্ন হয়। ফলে এক এক জড়দেহে অবস্থিত চেতনার ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এই কারনেই জীব জগতের বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে কেউ উৎকৃষ্ট আবার কেউ অন্যদের থেকে নিকৃষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মানুষদেরকে উৎকৃষ্ট জীব বলে মনে করা হয়। আবার মানুষদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ রয়েছে-ভাল, মন্দ, সম ইত্যাদি।

বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী স্ব-কর্ম অনুযায়ী আত্মা নিম্ন প্রজাতির জড়দেহ থেকে উচ্চ প্রজাতির জড়দেহে আশ্রয় নিতে পারে। আবার দুস্কর্মের জন্য আত্মা নিম্ন প্রজাতির জড় দেহ ধারন করতে পারে। এক্ষেত্রে জড় দেহের বিবর্তন দুই প্রক্রিয়ায় হতে পারে বলা হয়েছে। ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী বিবর্তনকে শুধুমাত্র নিম্ন থেকে উচ্চতর প্রজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। জীব সর্বোচ্চ স্তরে পৌছার পর তার গতি কি হবে বা হতে পারে তার কোন আভাস। ইংঙ্গিতে পর্যন্ত তার তত্ত্বে পাওয়া যায় না। মনুষ্য প্রাণীকুলের চেতনার নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তরে বিবর্তন ডারউইনের তত্ত্বে না পাওয়া গেলেও বৈদিক শাস্ত্রে তা রয়েছে। তবে শর্তবিহীন নয়। শর্ত হল সুকর্ম/সুকৃতি। তাছাড়া নিম্ন থেকে উচ্চতর প্রজাতির প্রাণীর আবির্ভাব ডারউইনের এই ধারনায় সাথে আপাতদৃষ্টিতে বৈদিক ধারনার মিল থাকলেও ব্যাখ্যার দিক থেকে সুপষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

ডারউইনের বেলায় একটি নিম্নতর জড়দেহের বিনাশ হয়ে একটি উন্নততর জড় দেহের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী চেতনার বিকাশ হলেই একটি নিম্নতর জড়দেহ থেকে বিকাশ প্রাপ্ত চেতনা (আত্মা) উন্নত আকৃতি এবং গুনাবলী বিশিষ্ট জড়দেহে স্থানান্তর হয়। এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া পূর্বের আত্মার সুকৃতি ফলে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সম্পাদিত হয়।